BL College Journal

ISSN 2664-228X
Volume -1, Issue-2, 2019
PP. 40-61

স্মৃতিকথায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : প্রাথমিক প্রতিরোধ প্রসঙ্গ

আরমান হোসাইন আজম

পিএইচডি গবেষক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং সহকারী অধ্যাপক, বাংলা (বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা)।

ই-মেইল : ahazam01@gmail.com

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক প্রতিরোধ প্রসঙ্গটি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথায় পাওয়া যায়। একাত্তরের মার্চ-এপ্রিল মাসে প্রতিরোধ যুদ্ধে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন, যাঁরা প্রতিরোধ যুদ্ধের ঘটনাকে দেখেছেন এবং যাঁরা দেশের বিভিন্ন জায়গায় সংঘটিত প্রতিরোধের ঘটনাকে শুনেছেন তাঁদের অনেকেই নিজেদের অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করে গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। যাঁরা প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে স্মৃতিচারণ করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা, পুলিশ, ইপিআর, আনসার এবং সামরিক বাহিনীর বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহী সদস্যগণ। তাছাড়া পাকিস্তানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যাঁরা কূটনৈতিক প্রতিরোধে অংশ নিয়েছেন এবং বিদেশের মাটিতে সভাসমাবেশ করে প্রতিবাদ-প্রতিরোধে অংশ নিয়েছেন তাঁদেরও অনেকে স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। স্মৃতিকথামূলক এসব গ্রন্থে প্রতিরোধ যুদ্ধের নানা চিত্র ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশের সর্বত্র পরিস্থিতি অনুযায়ী যার যা আছে তাই নিয়ে, যারা যেভাবে পেরেছে সেভাবেই প্রতিরোধ যুদ্ধে সম্পৃক্ত হয়েছেন। স্মৃতিকথায় এসব প্রতিরোধের পাঁচটি দিক লক্ষ করা যায়। দিকগুলো হলো শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ, রাস্তাঘাট অবরোধ, অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা, কূটনৈতিক প্রতিরোধ এবং সশস্ত্র প্রতিরোধ।

মূলশব্দ

স্মৃতিকথা, বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ, মুজিবনগর সরকার, মুক্তিবাহিনী, গণবাহিনী, রাজাকার, পুলিশ, ইপিআর

ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথার বড়ো একটি অংশ জুড়ে রয়েছে প্রতিরোধ প্রসঙ্গ। প্রতিরোধ যুদ্ধের স্মৃতিকথাগুলোতে অনেকে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণের স্মৃতিচারণ করেছেন, অনেকে প্রতিরোধ যুদ্ধের ঘটনাকে যেমন দেখেছেন তার স্মৃতিচারণ করেছেন, আবার অনেকে বিভিন্ন জায়গার প্রতিরোধ

যুদ্ধের ঘটনা শুনে তার বিবরণ দিয়েছেন। যাঁরা প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণের স্মৃতিচারণ করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা, পুলিশ, ইপিআর, আনসার, ও সামরিক বাহিনীর বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্য। প্রবাসী বাংলাদেশী যাঁরা পাকিস্তানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিদেশের মাটিতে বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছেন তাঁরা স্মৃতিচারণ করেছেন। স্মৃতিচারণগুলোতে প্রতিরোধের নানা প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিস্থিতি অনুযায়ী যার যা আছে তাই নিয়ে, যারা যেভাবে পেরেছে সেভাবেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার ক্ষেত্রে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেছেন। স্মৃতিকথায় এসব প্রতিরোধের পাঁচটি দিক দেখা যায়। দিকগুলো হলো শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ, রাস্তাঘাট অবরোধ, অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা, কূটনৈতিক প্রতিরোধ এবং সশস্ত্র প্রতিরোধ।

গবেষণার উদ্দেশ্য

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্বে মুক্তিযোদ্ধাসহ সর্বস্তরের মুক্তিকামী জনগণের প্রতিরোধ সম্বন্ধে নানা দিক অনুসন্ধান করা এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

গবেষণার পদ্ধতি

মুক্তিযোদ্ধা, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, প্রত্যক্ষদর্শী, শহিদ পরিবারের সদস্য, বিদেশী সাংবাদিক প্রমুখের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থের পাঠবিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ

স্মৃতিকথায় মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে সভাসমাবেশ, শ্লোগান, মিছিল ইত্যাদির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে পাকিস্তান সরকার ও সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের চিত্র পাওয়া যায়। এসব চিত্রে দেখা যায় প্রাথমিক প্রতিরোধ পর্বে লাঠি, বর্শা, বল্লম, দেশি বন্দুক ইত্যাদি সাধারণ অস্ত্র নিয়ে জনগণ রাস্তায় নেমেছে। প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য যারা সংগঠিত হয়েছে সাধারণ জনতা তাদেরকে খাবার, আশ্রয় ও সমর্থন দিয়ে সহযোগিতা করেছে। শহর ও শহরতলী থেকে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ভয়ে যারা পালিয়ে এসেছে তাদেরকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা দিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে। যাঁদের স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধের চিত্র পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আবু আক্কাস আহমেদ, জিয়াউদ্দিন আহমেদ, মুকুল মোস্তাফিজ, আবু সাঈদ খান প্রমুখ।

আবু আক্কাস আহমেদ 'মুক্তিযুদ্ধ : রণাঙ্গন নেত্রকোণা' গ্রন্থে লিখেছেন, ''১লা এপ্রিল পাকিস্তান সরকার ও সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁদের যে মিছিল হয় সেখানে ছিলো লাঠিসোঠা, বল্লম ইত্যাদি সাধারণ গ্রাম্য অস্ত্র।''[১] নেত্রকোণায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হেলিকপ্টার হামলার পর ছাত্র, যুবক ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের তদারকিতে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-যুবক সীমান্তের ওপারে চলে

যায়। মহেশখলা, মহাদেও, রংরা, বাগমারায় স্থাপন করা হয় ইয়ুথ ক্যাম্প। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার অদম্য বাসনা নিয়ে যুবকরা ছুটে যায় সেসব ক্যাম্পে। আবু আক্কাস লিখেছেন, "নেত্রকোণায় গোলাম এরশাদুর রহমানরা যতোটা এগিয়ে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়তো, প্রবীণ নেতৃবৃন্দ ততোটাই সাবধানে ও সুকৌশলে পদক্ষেপ নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা বলতেন বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো। আর আমাদের নেতারা বলতেন, অস্ত্র ধরার জন্য প্রস্তুতি নাও, ট্রেনিং নাও।"[২]

জিয়াউদ্দিন আহমেদ 'মুক্তিযুদ্ধে সুন্দরবন' গ্রন্থে প্রতিরোধ যুদ্ধে পিরোজপুরের সাধারণ জনতার ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। সে সময় আওয়ামী লীগ এবং স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিসমূহের আহ্বানে সমগ্র জনতা তাদের বাড়ি থেকে খাবার পাঠাতো। বিভিন্ন শহর থেকে জীবন বাঁচানোর জন্য পালিয়ে আসা অভুক্ত লোকদেরকে তাঁরা খাবার দিয়েছে। এ সময় তাঁরা জনগণের কাছে আরও বেশি খাবার পাঠানোর আহ্বান জানান। প্রতিদিন প্রচুর রুটি, গুড়, অন্যান্য শাকসব্জি, ডাব, নারিকেল– খেয়ে বাঁচা যায় এমন ধরনের খাবার প্রচুর পরিমাণে পান। এগুলো দিয়ে তাঁরা হাজার হাজার লোকের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করেন। পিরোজপুরের বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প করেন খাবার বিতরণ করার জন্য। এসময় খুলনায় লড়াই চলছে। সে লড়াইয়ের ময়দানে রুটি এবং অন্যান্য খাবার পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।[৩]

মুকুল মোস্তাফিজ 'মুক্তিযুদ্ধে রংপুর' গ্রন্থে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি রংপুরে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিরোধ যুদ্ধে তাঁদের অংশ নেওয়ার স্মৃতিচারণ করেছেন। জাতীয় চেতনা জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে তাঁরা নিরলসভাবে কাজ করেছেন। মুকুল মোস্তাফিজ অন্যান্যের পাশাপাশি নিজেও গান লিখে জনতাকে মুক্তিযুদ্ধে উজ্জীবিত করেছেন।[৪] মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে শিল্পীদলগুলো রংপুর শহরসহ শহরতলী এবং গ্রামাঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ দল হিসেবে অনুষ্ঠান করেছে। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে সশস্ত্র যুদ্ধের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অনেকেই সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, আবার অনেকে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ জনগণের মনোবলকে ঠিক রাখার জন্য শরণার্থী ক্যাম্প ও রিক্রুটিং ক্যাম্পগুলোতে তাঁদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে যুদ্ধে তাঁদের ভূমিকা রাখেন। যুদ্ধের প্রথম দিকে অনেক সাংবাদিক দেশের অভ্যন্তরে থেকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের রিপোর্ট করে তাঁদের প্রতিবাদ প্রতিরোধের ধারাকে অব্যাহত রাখেন। মুকুল মোস্তাফিজ লিখেছেন যে, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রংপুর থেকে যেসব পত্রিকা প্রকাশিত হয় সেগুলো হলো 'রণাঙ্গন', 'সোনার বাংলা', ও 'স্বাধীন বাংলা'।

আবু সাঈদ খান 'মুক্তিযুদ্ধে ফরিদপুর' গ্রন্থে ফরিদপুরের অম্বিকা ময়দানে ২৯শে মার্চ অনুষ্ঠিত জনসভার স্মৃতিচারণ করেছেন। সেখানে সভাপতিত্ব করেন অ্যাডভোকেট আদেলউদ্দিন আহমেদ। হাজার হাজার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাঁশের লাঠি, ঢাল, সড়কি, দা-কুড়াল, দেশীয় বন্দুক ইত্যাদি নিয়ে উপস্থিত হন। সভায় সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়ে রাজনৈতিক ও ছাত্রসংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন।

রাস্তাঘাট অবরোধ

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথায় প্রাথমিক প্রতিরোধ প্রচেষ্টাগুলোর মধ্যে রাস্তাঘাট অবরোধ অন্যতম। রাস্তায় রাস্তায় গাছপালা কেটে, বাস-ট্রাক রেখে পাকিস্তানিদের আগমনে প্রতিবন্ধকতা তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে। অধিকাংশ স্মৃতিকথায় এমন চিত্র পাওয়া যায়। মুক্তিযোদ্ধারা কখনো পাকিস্তানি বাহিনীকে ফাঁদে ফেলবার জন্য রাস্তাঘাটে ব্যারিকেড দিয়েছে। সামরিক বাহিনী যখন ব্যারিকেড সরাবার চেষ্টা করেছে মুক্তিবাহিনী তখন তাদের ওপর আক্রমণ করেছে। যাঁদের স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে রাস্তাঘাট অবরোধের মাধ্যমে প্রতিরোধের চিত্র পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আবুবকর সিদ্দিক, মাহফুজুর রহমান, কাদের সিদ্দিকী, আবু সাঈদ খান প্রমুখ।

আবুবকর সিদ্দিক তাঁর 'একটি স্বস্তিকর মৃত্যুসংবাদ ও অবরুদ্ধ যুদ্ধদশা' স্মৃতিকথামূলক লেখায় বাগেরহাটের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলির স্মৃতিচারণ করেছেন। বিদ্রোহের দিনগুলোতে স্কুল-কলেজ থেকে শিক্ষকরাও ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে প্রতিবাদী মিছিলে পথে নেমেছেন। তিনি লিখেছেন,

"মনে আছে, ২৫শে মার্চের পরে এমনি এক উত্তাল দিনে বাগেরহাটে খবর পৌঁছে গেলো, খুনী গভর্নর টিক্কা খান নিহত। সেদিন বাগেরহাট শহরের মুক্ত সড়কে বাঁধভাঙা জলস্রোতের মতো জনতার মত্ত মিছিল ভেঙে পড়েছিলো। আমি চাউলপট্টির গোবিন্দমন্দিরের পাশ দিয়ে প্রধান রাস্তায় উঠতেই দেখতে পাই, রিকশা না জিপ কিসের ওপর মঞ্চের মতো খাড়া করে আজ আর সঠিক মনে নেই, এক অছাত্র গ্রাম্য তরুণ মুখে মাইকের মাউথপিস ধরে উৎক্ষিপ্ত শার্দুলের মতো ঝম্ফ দিয়ে দিয়ে বাগেরহাটের খাস আঞ্চলিক টানে শ্লোগান দিচ্ছে, "মরেসে মরেসে– টেক্কা খান মরেসে।"[৫]

২৬শে মার্চ বেলা বারোটার দিকে বাগেরহাটের নিউমার্কেটের দোতলায় আওয়ামী লীগের অফিসে ২৫শে মার্চ ঢাকায় সংঘটিত পাকিস্তানি আর্মির গণহত্যায় উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় বসেন শেখ আবদুর রহমান, সরদার জলিল, আবদুস সাত্তার খান, আবদুল লতিফ খন্দকার, অজিয়র রহমান, ছাত্রনেতা তোসারফ হোসেন (সাপ্তাহিক 'রোববারে'র নির্বাহী সম্পাদক), আমিরুজ্জামান বাচ্চু প্রমুখ। সেখানে আচমকা আসেন অয়ারলেস অপারেটর রবীন। তিনি সঙ্গে করে নিয়ে আসেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণার বেতার বার্তার কপি। আবু বকর সিদ্দিক লিখেছেন, "এই বার্তা পেয়ে সবাই সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য দৃঢ় সংকল্প হয়ে ওঠেন মনে মনে । জনগণ যুদ্ধংদেহী। রূপসা বাগেরহাট রাস্তায় গাছ কেটে ফেলে ব্যারিকেড খাড়া করেন তাঁরা।"[৬]

মাহফুজুর রহমান 'মুক্তিযুদ্ধে হবিগঞ্জ' গ্রন্থে হবিগঞ্জে যুদ্ধপরিস্থিতি এবং প্রাথমিক প্রতিরোধের স্মৃতিচারণ করেছেন। হবিগঞ্জের পার্শ্ববর্তী সিলেট ও মৌলভীবাজারে তখন পাকিস্তানি সৈন্যরা অবস্থান করছিলো। সৈন্যরা যাতে হবিগঞ্জের দিকে না আসতে পারে সেজন্য রশিদপুর এলাকায় হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজারের সীমান্তে পাহাড়ি এলাকায় রাস্তার ওপর ঢাকা সিলেট মহাসড়কে বহুসংখ্যক ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হয়। এতে চা শ্রমিক, রাজনৈতিক কর্মী ও মুক্তিযোদ্ধারা অংশগ্রহণ করে।

কাদের সিদ্দিকী 'স্বাধীনতা '৭১' গ্রন্থে টাঙ্গাইলে তাঁর প্রতিরোধ যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেছেন। ২৯শে মার্চ রাতে সিদ্ধান্ত নেন ঢাকার রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করবেন। রাত আটটার দিকে তাঁরা পুল ভাঙতে যান। কয়েকটি দল বিভিন্ন দিকে গাছ কেটে ব্যারিকেড তৈরি করতে যান। পুল ভাঙার অস্ত্র হিসেবে সঙ্গে নেন কেরোসিন, ডিজেল, ১০–১৫ সের ওজনের অনেকগুলো হাতুড়ি, শাবল, গাঁইতি ও কয়েক মণ কাঠ। তাঁদের ধারণা, কংক্রিটের ব্রিজে অনেকক্ষণ আগুন জ্বালাতে পারলে এবং বড়ো বড়ো হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলে পুল ভেঙে যাবে। রডমিস্ত্রি সবুরকে নিয়ে প্রথমে যান কোদালিয়া ব্রিজে। সেখানে টিনের পর টিন কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন। ব্রিজের অনেক অংশ পুড়ে লাল হয়ে গেলে হাতুড়ি মারেন, কিন্তু ব্রিজের এক চিলতে সিমেন্টও ওঠে না। হতাশ হয়ে দুপাশের পাঁচ ছয়টা বড়ো গাছ কেটে রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করেন। মির্জাপুর ব্রিজ ভাঙার ক্ষেত্রটি ছিলো ভিন্ন রকমের। সেখানে শত শত জনতা ব্রিজ আগলে রাখে। জনতার ধারণা ব্রিজ ভাঙলে মিলিটারিরা আশেপাশের বাড়িঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে। তাঁরা ব্রিজ ভাঙতে পারলেন না। অবশেষে সারা রাস্তার ২৫-৩০ জায়গায় শতাধিক গাছ কেটে, ইট ফেলে, ভাঙা গাড়ি রেখে ব্যারিকেড তৈরি করেন।[৮]

আবু সাঈদ খান 'মুক্তিযুদ্ধে ফরিদপুর' গ্রন্থে লিখেছেন,

"২৬শে মার্চ সন্ধ্যায় ছাত্র-যুবকরা যশোর-ঢাকা রোডের ওপর গাছ কেটে রেখে পথরোধ করতে শুরু করে। তখন রাস্তার দুই ধারে বড়ো বড়ো গাছ ছিলো। সারা রাত ধরে গাছ কাটার কাজ চলে। রাস্তার দুই পাশের গ্রামবাসী দা কুড়াল নিয়ে কাজে অংশ নেয়। গোয়ালন্দে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাজবাড়ির নেতাদের সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে যোগাযোগ করা হয়। গোয়ালন্দে কাজী হেদায়েত হোসেন, ছাত্রনেতা আবদুল জব্বার প্রমুখের নেতৃত্বে ছাত্র, জনতা, আনসার, পুলিশের সমন্বয়ে গোয়ালন্দ ঘাটে ব্যারিকেড তৈরি হয়।"[৯]

অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথায় প্রাথমিক প্রতিরোধে অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতার চিত্র প্রায় সর্বত্র লক্ষ করা যায়। রাস্তাঘাট কেটে, ব্রিজ-কালভার্ট ভেঙে, রেললাইন উপড়ে ফেলে মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ জনতা পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর আগমনকে প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করেছে। কোনো কোনো জায়গায় পাকিস্তানি আর্মি এসব রাস্তাঘাট পুনর্নির্মাণ করে তাদের আক্রমণ পরিচালনা করেছে। কিন্তু প্রাথমিকভাবে চলার পথে তারা বাধাগ্রস্ত হয়েছে, আক্রমণ পরিচালনায় তাদের সময় নিতে হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আর্মিদেরকে অন্য পথে আক্রমণ পরিচালনা করতে হয়েছে। যাঁদের স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতার মাধ্যমে প্রতিরোধের চিত্র পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মনজুর মোরশেদ সাচ্চু, এ কে এম ওয়াহেদুল ইসলাম, আবু জাফর শামসুদ্দীন, চিত্তরঞ্জন দত্ত প্রমুখ।

মনজুর মোরশেদ সাচ্চু 'মুক্তিযুদ্ধ ও দেরাদুনে ষাট দিন' গ্রন্থে রাজবাড়ির পাংশায় যাতে শত্রুরা প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য তাঁদের প্রতিরোধ কার্যক্রম ও সাধারণ জনতার ভূমিকার স্মৃতিচারণ

করেছেন। ২৫শে মার্চ ঢাকায় পাকিস্তানি আক্রমণের পর ঢাকা থেকে তাঁদের কাছে পাংশার রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার নির্দেশনা পৌঁছায়। রাতে রেলওয়ের কর্মচারীরা পাংশার দুপাশের রেল লাইনের নাটবল্টু খোলা আরম্ভ করে। ঘণ্টা খানেক পর ছাত্রলীগ ও স্বাধীনতার পক্ষের বিভিন্ন সংগঠনের ছাত্রকর্মীরা আসে। খবরটা রাতের অন্ধকারে আশেপাশের গ্রামে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ভোরের আলো কিছুটা উজ্জ্বল হতেই হাজার হাজার লোক শ্লোগান সহকারে রেললাইন টেনে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। হাজার হাজার লোকের সমাগমে তখন স্টেশন বাজার সয়লাব হয়ে যায়।[১০]

মনজুর মোরশেদ সাচ্চু কুষ্টিয়ায় অবস্থানরত পাকিস্তানি বাহিনীকে আক্রমণ করার একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনা মতে সাধারণ জনতা ও রেল কর্মচারীরা খুলে ফেলা রেল লাইনটি পুনঃস্থাপন করে। পর দিন বেলা তিনটায় রাজবাড়ি থেকে আনসার ও পুলিশ নিয়ে একটি ট্রেন পাংশায় পৌঁছায়। পাংশা থেকে কিছু আনসার সদস্য স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যাওয়ার জন্য হাজির হয়। পাংশা থেকে একটি মেডিকেল টিম গঠন করা হয়। পাংশা স্টেশন লোকে লোকারণ্য হয়ে গগনবিদারী শ্লোগান দেয়। গ্রামের হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসে তাঁদের স্বাগত জানানোর জন্য, কিন্তু কেউ খালি হাতে আসেনি। কারও হাতে ডাব, কারও হাতে রুটি, কারও হাতে কলা, কারও হাতে গুড়– যে যেভাবে পেরেছে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। এগুলো সঙ্গে নিয়ে তাঁরা কুষ্টিয়ায় পাকিস্তানি বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য রওনা দিলেন। এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী জয়লাভ করে, কিন্তু দিয়ানত নামের একজন আনসার শহিদ হন। দিয়ানতের লাশ দেখার জন্য পথে পথে অগুণতি মানুষের ভিড় জমে। তারা গগনবিদারী শ্লোগান দেয়। গোয়ালন্দ ঘাটে ব্যারিকেড দেওয়ার ঘটনা উল্লেখ করে মনজুর মোরশেদ সাচ্চু বিস্ময় প্রকাশ করে লিখেছেন—

"এবার গোয়ালন্দ ঘাটে ব্যারিকেড দিয়ে রাখতে হবে, যাতে আরিচা থেকে কোনো পাকিস্তানি সেনার দল নৌপথে এদিকে আসতে না পারে। আমাদের পাংশা থেকেও কিছু আনসার এই ব্যারিকেডে অংশ নেওয়ার জন্য গোয়ালন্দ রওনা হলো। আমরা পাংশাতেও রাতের বেলা পাহারা দেওয়ার জন্য একটা দল গঠন করলাম, যাতে পাকিস্তানি বাহিনী পাংশাতে প্রবেশ করতে না পারে। আজও সেই প্রস্তুতির কথা মনে পড়লে হাসি পায়। আমাদের হাতে ছিলো কয়েকটা একনলা-দোনলা বন্দুক, লাঠি, দা, কুড়াল এসব অস্ত্র। ...তবে আমাদের মনোবল ছিলো প্রচুর। যার ফলে এই সামান্য অস্ত্র নিয়ে একটা বিশ্বসেরা সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করা আমাদের কাছে কোনো ব্যাপারই মনে হতো না।"[১১]

এ কে এম ওয়াহেদুল ইসলাম 'দিনাজপুরে মুক্তিযুদ্ধ' গ্রন্থে দিনাজপুরে প্রাথমিক প্রতিরোধের স্মৃতিচারণ করেছেন। ২৫শে মার্চের পর ১০ থেকে ১২ দিন দিনাজপুর মুক্ত ছিলো। মহনপুর ব্রিজ তাঁর বাড়ি থেকে দেড় দুই মাইল দূরে। ফুলবাড়ি থেকে যেন কোনো পাকিস্তানি সৈন্য আসতে না পারে সেজন্য তাঁরা ইপিআর নিয়ে সেখানে অবস্থান করেন। তাঁর ইউনিয়নে তিনি মিটিং করেন। তাঁরা মহনপুরের রাস্তা কেটে প্রতিরোধ গড়তে গেলে মহেশপুরের খলিল চেয়ারম্যান সেখানে বাধা দেন। পরে অঞ্চলের সবাই মিলে তাঁর কাছে গেলে তিনি সরে দাঁড়ান। তখন রাস্তা কেটে পাকিস্তানি বাহিনীর গতিরোধের চেষ্টা করা হয়। ১৩ই এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনী ভাঙা রাস্তা পুনরায় নির্মাণ করে এক পর্যায়ে দিনাজপুর শহরে ঢুকে পড়ে।[১২]

আবু জাফর শামসুদ্দীন 'আত্মস্মৃতি' গ্রন্থে জনসাধারণের অবকাঠামোগত প্রতিরোধচিত্রের স্মৃতিচারণ করেছেন। তিনি ঢাকা থেকে ১লা এপ্রিল জামালপুরের দক্ষিণবাগে তাঁর গ্রামের বাড়ি পৌঁছান। সেখানে তিনি আর্মির অগ্রযাত্রাকে প্রতিরোধ করবার প্রাথমিক প্রচেষ্টা লক্ষ করেন। তিনি লিখেছেন,

"দস্যু বাহিনী রেললাইন মেরামত করে আড়িখলা পর্যন্ত এসেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেলো। এ সংবাদ সত্য বলে মনে হয় না। তবু এ সংবাদ পাওয়া মাত্র স্থানীয় লোকজন ঘোড়াশালের রেলসেতুর ওপরের রেললাইন খুলে ফেলেছে শুনলাম। নীচের মূল স্ট্রাকচার ঠিকই থাকে, ওপরের রেল ও স্লিপার খুলে নদীতে ফেলে দেয়। জ্যেষ্ঠপুত্র খোকা জামালপুর বাজারে ছিলো। সে ফিরে এসে এ সংবাদ দিলো। ... (১২ এপ্রিল) ঘোড়াশালে আগত ট্রেনটিতে তিনটি বগি, দুটিতে পাঞ্জাবি সেনা, অন্যটিতে রেললাইন মেরামতের জন্য রেলস্লিপার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি।"[১৩]

মুক্তিযুদ্ধে ৪ নং সেক্টর সিলেটের দায়িত্বে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার চিত্তরঞ্জন দত্ত। তিনি সিলেট এলাকার যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেছেন। সিলেটে তখন দুটি সাব-সেক্টর খোলা হয়। বিডিআর, আনসার, মুজাহিদ ও পুলিশকে নিয়ে গড়ে ওঠে 'সেক্টর ট্রুপস' আর স্কুল-কলেজের ছাত্রদের নিয়ে গড়ে ওঠে 'গণবাহিনী।' সেক্টর ট্রুপসের কাজ ছিলো শত্রুদের ধ্বংস ও অ্যামবুশ করা, এবং গণবাহিনীর কাজ ছিলো পুল ধ্বংস করা, মাইন পোঁতা ও ছোটোখাটো শত্রু ঘাঁটি ধ্বংস করা। সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক থেকে তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো তাঁর এলাকার সকল চা বাগান অকেজো করে দেওয়া।

কূটনৈতিক প্রতিরোধ

মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাংলাদেশীদের স্মৃতিকথায় পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে তাঁদের কূটনৈতিক ভূমিকার চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার প্রধান ও পদস্থ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে, সভা-সমাবেশের আয়োজন করে পাকিস্তান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিবাদ জানিয়েছেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছেন। বিদেশের মাটিতে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে কূটনৈতিকভাবে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নিয়ে তাঁরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করেছেন। পরবর্তীকালে প্রবাসীদের মধ্যে যাঁরা স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আবু সাঈদ চৌধুরী, আবদুল মতিন, আবুল মাল আবদুল মুহিত প্রমুখ।

আবু সাঈদ চৌধুরী 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি' গ্রন্থে তাঁর প্রবাস জীবনে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে যেসব কার্যক্রম সম্পাদন করেছেন সেসব ঘটনার বিস্তৃত স্মৃতিচারণ করেছেন। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে আবু সাঈদ চৌধুরী সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় ছিলেন। তিনি সেদিন সকাল বেলায় বিবিসির মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের ওপর পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর 'অপারেশন সার্চলাইট' প্রয়োগের সংবাদ পান।[১৫] ঐদিনই তিনি আন্তর্জাতিক বিশ্বের কাছে পাকিস্তানের বর্বরোচিত হামলার সংবাদটি পৌঁছে দেন। তিনি লিখেছেন,

"যথারীতি সাড়ে দশটায় জেনেভাস্থ জাতিসংঘ প্রাসাদে মানবাধিকার কমিশনের কাজ শুরু হলো। চেয়ারম্যানের অনুমতি নিয়ে সভার প্রারম্ভে বিবিসির খবরের কথা উল্লেখ করে বললাম : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসেবে আমি অত্যন্ত শংকিত হয়ে পড়েছি। আমি এখনই আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আজকেই লন্ডনে ফিরে যাবো এবং সেখান থেকে সম্ভব হলে ঢাকায়। আজকের সন্ধ্যায় বর্তমান অধিবেশনের সমাপ্তি পর্যন্ত থাকতে পারছি না।"[১৬]

কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশে ফিরতে পারেননি। ব্রিটেনে অবস্থান করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শেষ অবধি কূটনৈতিক যুদ্ধ চালিয়ে যান। জেনেভা থেকে লন্ডনে ফিরে ২৭শে মার্চ শনিবার তিনি ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের প্রধান ইয়ান সাদারল্যান্ড এবং ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর একান্ত সচিব ব্যারিংটনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।[১৭] আবু সাঈদ চৌধুরী লিখেছেন যে, সাক্ষাতের সময়ে সাদারল্যান্ডের নিকট ঢাকাস্থ ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনার ফ্রাংক সার্জেন্টের একটি টেলেক্স পৌঁছায়। টেলেক্সের মাধ্যমে তাঁরা ২৫শে মার্চ রাত্রির ভয়াবহ গণহত্যার বিস্তারিত তথ্য জানতে পারেন। জানতে পারেন, সান্ধ্য আইন শিথিল হলে একজন ফার্স্ট সেক্রেটারি অল্পক্ষণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। তিনি দেখতে পান ইকবাল হলের সিঁড়ি বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। জগন্নাথ হলে গণকবর খনন করে সেখানে ছাত্র-শিক্ষকদের মৃত দেহ ছুড়ে ফেলা হয়েছে। গুলির ভয় দেখিয়ে যে ছাত্রদের দ্বারা মৃত দেহ গণকবরের সামনে আনা হয় পরে তাদেরকেও গুলি করে সেই কবরেই ফেলা হয়। ঢাকার অন্যান্য জায়গায়, রাস্তায় রাস্তায় তাঁরা অনেক মৃত দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। সাদারল্যান্ড জানান, সেখানে ব্রিটিশ নাগরিকদের ফিরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ রয়েছে এবং জানানো হয়েছে আর কোনো টেলেক্স পাঠানো সম্ভব হবে না। কারণ প্রত্যেক দূতাবাসকে পাকিস্তান সরকার টেলেক্স ব্যবহার করতে নিষেধ করেছে। আবু সাঈদ চৌধুরী লিখেছেন,

"ক্ষোভে, দুঃখে, বেদনায় ও অপমানে আমি তখন বিহ্বল। আমি সাদারল্যান্ডকে বললাম, এই মুহূর্ত থেকে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক রইল না। আমি দেশ থেকে দেশান্তরে যাবো আর পাকিস্তানি সৈন্যদের এই নিষ্ঠুরতা-নির্মমতার কথা বিশ্ববাসীকে জানাবো। তারা আমার ছেলে-মেয়েদের হত্যা করেছে। এর প্রতিবিধান চাই।"[১৮]

মুজিবনগর সরকার পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে ব্যাপক আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেন। আবু সাঈদ চৌধুরী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সফরকালে সরকারি ও বেসরকারি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দাবির মর্মার্থ ব্যাখ্যা করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন।

আবদুল মতিন 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি : যুক্তরাজ্য' গ্রন্থে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সংগঠিত আন্দোলন, সভা-সেমিনার এবং কূটনৈতিক নানা তৎপরতার সমর্থনে পরিচালিত কর্মকাণ্ডের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি একজন সাংবাদিক। সাংবাদিক হিসেবে যুক্তরাজ্যে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের পক্ষে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন।

আবুল মাল আবদুল মুহিত 'স্মৃতি অম্লান ১৯৭১' গ্রন্থে ওয়াশিংটনে পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত অবস্থায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যেসব ভূমিকা পালন করেছেন তার স্মৃতিচারণ করেছেন। ২৫শে মার্চ বাংলাদেশে যখন গণহত্যা শুরু হয় ওয়াশিংটনে তখন দুপুর বেলা। কিন্তু সংবাদটি তাঁরা পান বারো ঘণ্টা পর ২৬শে মার্চ ভোর বেলা। ২৬শে মার্চের ভোরে স্টেট ডিপার্টমেন্টের পাকিস্তান ডেস্কের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ক্রেইগ ব্যাক্সটার টেলিফোনে তাঁকে খবরটি জানান এবং রেডিও শুনতে বলেন। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সূচনার সংবাদ তিনি রেডিওর মাধ্যমে জানতে পারেন। ওয়াশিংটনে বাঙালিরা খবরটি শুনে খুব ক্ষুব্ধ হন। আবুল মাল আবদুল মুহিত লিখেছেন,

"সাতাশে বিকেলে ওয়াশিংটনের বাঙালি সমাজ আমার বাসায় হাজির। যে খবর পেয়েছে সেই এসেছে। আমার মনে হলো পরিবার পরিজন নিয়ে আমাদের সংখ্যা ছিলো প্রায় সত্তর। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সবাই হাজির, পাকিস্তানি ধ্বংসযজ্ঞের প্রতিবাদ করতে হবে এবং একে প্রতিহত করার কথা ভাবতে হবে। ঢাকার হত্যাযজ্ঞ এবং দেশব্যাপী ধ্বংসলীলা পাকিস্তানের কবর রচনা করেছে। এখন বিবেচনার বিষয় একটি, কি করে, কতো দ্রুততার সঙ্গে পাকিস্তানি সামরিকবাহিনীকে বাংলাদেশ থেকে উৎপাটন করা যাবে। উদ্যোক্তা হিসেবে আমাকেই বলতে হলো আমরা এখন আর পাকিস্তানি নই এবং পাকিস্তানি হায়েনাদের শায়েস্তা করা আমাদের কর্তব্য। প্রবাসে আমরা জনমত গড়ে তুলতে পারি। আমাদের দেশে ত্রাণকার্য এবং যুদ্ধ উদ্যোগে সাহায্য করতে পারি এবং পাকিস্তানকে সর্বতোভাবে অপদস্থ করতে পারি। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত হলো যে, মার্কিন ও আন্তর্জাতিক নেতাদের কাছে বার্তা পাঠাতে হবে। আরো ঠিক হলো যে, সোমবারে শোভাযাত্রা হবে– কংগ্রেস সিঁড়িতে, বিশ্বব্যাংক ও মুদ্রা তহবিলের সামনে আর স্টেট ডিপার্টমেন্টের সামনে।"[১৯]

২৯শে মার্চ তাঁরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। কূটনৈতিক তৎপরতার অংশ হিসেবে ২৮শে মার্চ তাঁরা তারবার্তা পাঠান। বাংলাদেশের নাগরিকদের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট নিক্সন, সেক্রেটারি রজার্স, নিরাপত্তা সহকারী কিসিনজার এবং সিনেটে বৈদেশিক বিষয়ের চেয়ারম্যান সিনেটর ফুলব্রাইটের নিকট বার্তা পৌঁছানো হয়। এই সঙ্গে জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্ট এবং নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির নিকট আবেদন পাঠানো হয়। বিক্ষোভ প্রদর্শনে প্রায় দুশো লোকের র‍্যালি হয়। এই বিক্ষোভ কংগ্রেসের অনেক জনপ্রতিনিধির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়।

সশস্ত্র প্রতিরোধ

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের সশস্ত্র প্রতিরোধের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। এসব চিত্রে দেখা যায় যে, প্রাথমিক প্রতিরোধ হিসেবে মিছিল-মিটিং, রাস্তাঘাট অবরোধ, অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদির পাশাপাশি সশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। প্রাথমিক পর্যায়ে থানা সদরের অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র, স্কুল কলেজের ক্যাডেট কোরের অস্ত্র এবং ব্যক্তিগত অস্ত্র নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা সশস্ত্র প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। ইপিআর, আনসার, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর বিদ্রোহী সদস্যরা তাঁদের অস্ত্র নিয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করে তাদের অস্ত্র নিয়ে মুক্তিবাহিনী নিজেদের অস্ত্রভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেন। এরপর

ভারত সরকারের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হলে সশস্ত্র যুদ্ধে গতি সঞ্চার হয়। যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ের সশস্ত্র প্রতিরোধের স্মৃতিচারণ করে যাঁরা গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– এম এ জলিল, গোলাম মোস্তফা গিয়াসপুরী, হাফিজ উদ্দিন আহমদ, কাজী আনোয়ারুল ইসলাম, কাদের সিদ্দিকী, মনসুর আহমদ খান, গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী, মো. জহুরুল ইসলাম বিশু, কাজী আব্দুর রশিদ, এম আব্দুর রহিম, কে. এম. সফিউল্লাহ্, নাসির উদ্দিন, সুকেশচন্দ্র দেব, আখতার আহমেদ, শাফায়াত জামিল, রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

এম এ জলিল তাঁর স্মৃতিকথায় মুক্তিযুদ্ধে বরিশালে ১৭ই এপ্রিলের প্রতিরোধ যুদ্ধের ঘটনা তুলে ধরেছেন। সেদিন বরিশালে পাকিস্তানি একজন গোয়েন্দাকে গ্রেফতার করেন এবং বরিশাল স্টেডিয়ামে জনতার সামনে প্রকাশ্যে তাকে গুলি করে হত্যা করেন। এই ঘটনার ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানি বিমান বাহিনীর দুইখানা স্যাবর-জেট বিমান বরিশালের আকাশে উড়তে দেখেন। বরিশালে পাকিস্তানি বাহিনীর এটা প্রথম আক্রমণ। এই বিমান আক্রমণকে প্রতিরোধ করার অস্ত্র তাঁদের কাছে ছিলো না। তবে সাহসী মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের রাইফেল দিয়ে গুলি করার অনেক চেষ্টা করেছেন। শহরের বিভিন্ন বেসামরিক অবস্থানের ওপর বিমান থেকে তারা নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করেছে। এতে মুক্তিযোদ্ধাদের ছোটোখাটো আঘাত ছাড়া বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি।[২০]

গোলাম মোস্তফা গিয়াসপুরী 'মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস : রাজবাড়ী জেলা' গ্রন্থে গোয়ালন্দ ঘাট প্রতিরোধ যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্ন থেকেই গোয়ালন্দ ঘাটের বীর জনতা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দুর্গ গড়ে তোলেন। আরিচা থেকে নগরবাড়ি ঘাট ও গোয়ালন্দ ঘাট পতনের জন্য পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মরিয়া হয়ে ওঠে। সন্ধ্যা হলেই নৌ তরীতে সার্চলাইট জ্বালিয়ে গতিপথ অনুসন্ধানে মেতে ওঠে। এদিকে পদ্মার নদীপাড়ের মানুষ দিনরাত সারিবদ্ধভাবে দেশীয় অস্ত্র, ঢাল তলোয়ার, তীর ধনুক, বল্লম ইত্যাদি নিয়ে 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,' ইত্যাদি শ্লোগান দিয়ে প্রস্তুত হতে থাকে। রাজবাড়ি শহর থেকে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ গোয়ালন্দ প্রতিরোধ রণাঙ্গনের শক্ত ঘাঁটি গড়ে তোলার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এসডিও শাহ মো. ফরিদ, আনসার প্রশিক্ষক মো. খোরশেদ আলম, আক্কাছ আলী মিয়া, মো. বফু চৌধুরী, আ. রাজ্জাক (অব. সেনা সদস্য), মো. আবদুল হাকিমসহ বেশকিছু যুবক, এবং ৬৩ জন আনসার সদস্য স্পেশাল ট্রেনে রাজবাড়ি থেকে গোয়ালন্দ যাত্রা করে। পথে হাজার হাজার মানুষ তীর ধনুক, লাঠি, বল্লম ইত্যাদি নিয়ে ট্রেনে উঠে পড়ে। তাঁদের শ্লোগান ছিলো 'চলো চলো, গোয়ালন্দ চলো', 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' ইত্যাদি। মাইকে মাইকে, মুখে চুঙ্গা লাগিয়ে গোটা গোয়ালন্দ এলাকায় প্রচার শুরু হয়। অসংখ্য মানুষ রাতের অন্ধকারে গোয়ালন্দ ঘাটে ছুটে আসে। এভাবে ২১শে এপ্রিল বুধবার পর্যন্ত বাংলার বীর জনতা গোয়ালন্দ ঘাট শত্রু মুক্ত রাখে। কিন্তু ভোর চারটার দিকে পাকিস্তান বাহিনী ৩টি স্টিমার, ২টি গানবোট, প্যারামিলিটারি সৈন্য, ৩টি লঞ্চ, ২টি হেলিকপ্টার, ট্যাংক রেজিমেন্ট সমরাস্ত্রসহ বাঙালি মুক্তিবাহিনীর ওপর গুলিবৃষ্টির মতো অতর্কিত আক্রমণ চালায়। ভূমিতে গান পাউডার ছড়িয়ে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। হেলিকপ্টার থেকে কভারিং দিয়ে মিলিটারি বাহিনী

কামারডাঙ্গী চরে নেমে আসে। পাকিস্তানি বাহিনীর বেপরোয়া আক্রমণে চরাঞ্চলে অসংখ্য নিরীহ মানুষ নিহত হয়। গোটা গোয়ালন্দ ঘাট আগুনের লেলিহান শিখায় দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। ভেঙে পড়ে বাঙালির প্রতিরক্ষা ব্যূহ।[২১]

হাফিজ উদ্দিন আহমদ তাঁর 'রক্তেভেজা একাত্তর' গ্রন্থে যশোর ক্যান্টনমেন্টে বাঙালি সৈনিকদের বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেছেন। এ যুদ্ধটি হয় ৩০শে মার্চ ১৯৭১। যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে ১৫মাইল দূরে জগদীশপুর গ্রামে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটালিয়ন শীতকালীন ট্রেনিং এক্সারসাইজে ছিলো। ব্রিগেড সদর দপ্তর থেকে ট্রেনিং অসমাপ্ত রেখে তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। ২৯শে মার্চ রাত প্রায় ১২টায় তারা ক্যান্টনমেন্টে পৌঁছেন। অস্ত্রাগারে অস্ত্র জমা দিয়ে সবাই ব্যারাকে ফিরে যান। হাফিজ উদ্দিন লিখেছেন,

"পরদিন ৩০ মার্চ, সকাল সাড়ে সাতটা। দীর্ঘ পদযাত্রাজনিত ক্লান্তির জের তখনো কাটেনি, সবেমাত্র হাতমুখ ধুয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছি, সামনে এসে দাঁড়ালো আমার অর্ডারলি। চেহারায় দারুণ উত্তেজনার ছাপ, চোখের কোণে পানি টলমল করছে, 'স্যার, সর্বনাশ হয়েছে, আমরা হাতিয়ার সাফ করতে সবাই কোতে (অস্ত্রাগার) গিয়েছিলাম, ব্রিগেড কমান্ডার সাহেব অর্ডার দিয়েছেন আমরা আর হাতিয়ার ধরতে পারবো না। শিগগিরই নাকি বালুচ রেজিমেন্ট এসে আমাদের কোত থেকে সব হাতিয়ার নিয়ে যাবে।"[২২]

এ সংবাদে বাঙালি সৈনিকেরা অস্ত্রাগার ভেঙে অস্ত্র নিয়ে পজিশনে যায়। শুরু হয় উভয় পক্ষের গোলাগুলি। এক পর্যায়ে ক্যাপ্টেন হাফিজ বাঙালি সৈনিকদের নেতৃত্ব নেন। বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে বাঙালি সুবেদার মজিদ জানান গুলি প্রায় শেষ। ক্যাপ্টেন হাফিজ সবাইকে নিয়ে পিছু হটার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি লিখেছেন,

"আমরা ছোটো ছোটো গ্রুপে তিন জন করে আলাদাভাবে এগোতে লাগলাম। আমবাগান থেকে বেরিয়ে মাঠে নামতেই গুলিবৃষ্টির মধ্যে পড়লাম। শুকনো মাঠ, গুলির আঘাতে ধুলো উড়ছে চতুর্দিকে। একটি গ্রুপে আমি, হাবিলদার করিম, ইব্রাহিম এবং আরও দু'একজন দ্রুত দৌড়ে গেলাম সামনের খিতিবদিয়া গ্রামের দিকে। মিনিট দশেকের মধ্যেই গাছগাছালিতে ঢাকা গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়লাম আমরা। দেখলাম এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য। কয়েকশ' গ্রামবাসী দা, খন্তা, বর্শা, কুড়াল হাতে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। 'জয়বাংলা' ধ্বনি দিয়ে আমাদের বুকে জড়িয়ে ধরলো তারা।"[২৩]

যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে পিছু হটে তারা চৌগাছা ইপিআর বাঙালি সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হন। এই যুদ্ধে পিছু হটার সময় লে. আনোয়ার শহিদ হন।

'আমার একাত্তর' গ্রন্থে কাজী আনোয়ারুল ইসলাম খুলনার খালিশপুরে ক্রিসেন্ট জুটমিল এলাকায় পাকিস্তান আর্মি ও বিহারিদের বিরুদ্ধে বাঙালিদের প্রতিরোধ যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেছেন। সে সময়ে তিনি ক্রিসেন্ট জুটমিলের লেবার এডভাইজার পদে চাকরি করতেন। বিহারি বাঙালি মিলে ক্রিসেন্ট জুটমিলে তখন শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ১০,০০০। আনোয়ারুল ইসলাম উল্লেখ করেছেন সাতাশে মার্চ

সকাল নয়টার দিকে তাঁরা একটি নেভাল গানবোট অফিসার্স কলোনির দিকে আসতে দেখেন। বোটের সৈন্যরা কলোনির দিকে হাত উঁচিয়ে এমন ভাব দেখায় যে তারা এসে গেছে আর কোনো চিন্তা নেই। বাঙালিদের ধারণা নেভির বাঙালিরা বিদ্রোহ করে বেরিয়ে এসেছে। একটু পরেই গানবোট থেকে কামান দাগা শুরু হয়। কামানের গুলি এসে পড়তে থাকে নদীর দুইধারের জুটমিলের কলোনিগুলোতে। সবারই দিশেহারা অবস্থা। কাজী আনোয়ার কোনোরকমে ছুটে গিয়ে বিল্ডিংয়ের পিছনে আবর্জনার মধ্যে শুয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচান।

কাজী আনোয়ারুল ইসলাম দেখেছেন কিভাবে জুটমিলের বাঙালিদের ওপর বিহারিদের লেলিয়ে দিয়ে অন্যদিক দিয়ে আর্মিরা প্রবেশের চেষ্টা করে। বাঙালি পুলিশ ও যুবকরা ট্রেঞ্চ কেটে ব্যারিকেড দিয়ে আর্মিদের প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত। সে মুহূর্তে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর ট্রাক ঢোকার চেষ্টা করে। ব্যারিকেডের জন্য তারা অগ্রসর হতে পারেনি। ট্রাক থামিয়ে দুইধারের বাঙালি শ্রমিকদের ডেকে দুই একটা ব্যারিকেড তারা পরিষ্কার করে। এরপর শ্রমিকদের লাইনে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করে। অন্যদিকে কাঁধে ঢোল ঝুলিয়ে বিহারি মহিলারা সম্মুখ ভাগে থেকে ঢোল বাজিয়ে আর তাদের পিছনে বিহারি পুরুষেরা হাতবোমা নিয়ে এগিয়ে যায় এবং বাঙালিদের দিকে ছুড়ে মারে। প্রাণভয়ে বাঙালিরা পালাতে থাকে। কেউ নদীতে ঝাঁপ দেয়। আনোয়ারুল ইসলাম লিখেছেন,

"বিহারিরা যখন হাতবোমা মারা শুরু করে তখন থ্রি নট থ্রি রাইফেল নিয়ে তিন-চার জন পুলিশ ট্রেঞ্চে বসেছিলো। তাদের সঙ্গে ছিলো কয়েক জন বাঙালি শ্রমিক, হাতে টু টু বোর রাইফেল। এরা বাইরের মেইন গেটের দিকে তাক করে বসেছিলো। উদ্দেশ্য ছিলো আর্মির আক্রমণ প্রতিহত করা। এরা এখন পিছন দিকে মুখ ঘুরিয়ে বিহারিদের লক্ষ করে গুলি ছোঁড়া শুরু করেছে। থ্রি নট থ্রি রাইফেলের সামনে হাত বোমা বেশিক্ষণ টিকতে পারে না। অল্পক্ষণের মধ্যেই বিহারিরা পিছু হটতে লাগলো। এই খবর পেয়ে যেসব বাঙালি কিছুক্ষণ আগে বিহারিদের ভয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলো তারা দলে দলে নদী থেকে উঠে আসতে লাগলো। যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে বিহারিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কারও হাতে লাঠি, কারও হাতে ছুরি, কারও হাতে বল্লম ইত্যাদি। বিহারিরা প্রাণপণে ছুটে পালাচ্ছে, বাঙালিরা আক্রমণ করছে। হিংস্রতায় ভরপুর ছিলো এই আক্রমণ।"[২৪]

মনসুর আহমদ খান 'মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী' গ্রন্থে রাজশাহীতে পুলিশ বাহিনী কর্তৃক পাকিস্তানি বাহিনীকে প্রতিরোধ যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন। শাহ আঃ মজিদ সড়কে পুলিশবাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবক দলের হাতে পাকিস্তানি বাহিনী ২৬শে মার্চ প্রথম বাধাপ্রাপ্ত হয়। পাকিস্তানি আর্মি বাঙালি পুলিশদের তৎপরতা জেনে গেলে ইপিআর ক্যাম্প ও পুলিশ লাইন তাদের প্রধান লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়। পাকিস্তানি সেনারা পুলিশ লাইনের কাছে গিয়ে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়ে। এসময় পুলিশ লাইনের ভিতর থেকে পাল্টা গুলি ছুড়লে উভয় পক্ষের গোলাগুলি শুরু হয়। এতে বেশ কয়েকজন সাধারণ লোক নিহত হয়। এদিকে শহরের সর্বস্তরের মানুষ রুটি, চা, পানি ও অন্যান্য খাদ্য পুলিশ বাহিনীকে সরবরাহ করে। পুলিশরা সারারাত বিক্ষিপ্তভাবে গুলি ছোড়ে। পুলিশ বাহিনীর তীব্র প্রতিরোধের মুখে

পাকিস্তানি বাহিনী তখন পিছু হঠতে বাধ্য হয়। পুলিশ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আলোচনার মাধ্যমে একমত হয় যে, তাঁরা কেউ কাউকে আক্রমণ করবে না। কিন্তু পাকিস্তানি সেনারা চুক্তি ভঙ্গ করে ২৭শে মার্চ দুপুর বেলায় বিপুল বিক্রমে পুলিশ লাইন আক্রমণ করে। শুরু হয় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। পুলিশ বাহিনী আপ্রাণ চেষ্টা করে কিন্তু পাকিস্তানি সেনাদের ভারী অস্ত্র আর গোলাবারুদের মুখে টিকতে পারেনি। রক্তের বন্যায় ভেসে যায় পুলিশ লাইন চত্বর। ১৭ জন পুলিশের লাশ ফেলে পাকিস্তানি সেনারা চলে যায়।[২৫]

গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী 'যুদ্ধে যুদ্ধে একাত্তরের নয় মাস' গ্রন্থে রাজশাহী ও নওগাঁ অঞ্চলে তাঁর সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেছেন। তিনি নওয়াবগঞ্জ, রাজশাহী, নওগাঁ ও বগুড়ায় পাকিস্তানি আর্মিদের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করবার নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি মার্চ মাসে নওগাঁয় ইপিআরের ৭নং উইংয়ের সহকারী কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করছিলেন। মেজর নাজমুল হক ১৮ই মার্চ উইং কমান্ডার হিসেবে নিযুক্ত হন। পরে তিনি রাজশাহী অঞ্চলের সেক্টর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। নাজমুল হকের সঙ্গে পরিকল্পনা করে গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী প্রতিরোধ যুদ্ধে অগ্রসর হন। পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

"আমি মেজর নাজমুল হকসহ পরিকল্পনা করলাম যে, ২৮শে মার্চ প্রথমত এক কোম্পানি ইপিআর এবং শ'খানেক ছাত্র নিয়ে বগুড়ার দিকে রওনা হবো এবং আরেক কোম্পানি ইপিআর ফোর্স নাটোরের রাস্তা দিয়ে সারদায় পাঠাবো ক্যাডেট কলেজের অ্যাডজুটেন্ট মেজর রশীদের কাছে। এবং রংপুর থেকে রাজশাহী যাবার রাস্তা বগুড়ায় বিচ্ছিন্ন করে দেবো। অন্যদিকে মেজর রশীদ তাঁর ফোর্সসহ ঢাকা থেকে রিইনফোর্সমেন্ট নিয়ে রাজশাহী আসার রাস্তা বিচ্ছিন্ন করে দেবে।"[২৬]

গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী তাঁর বগুড়ার প্রতিরোধ যুদ্ধের বিবরণ দিয়েছেন। ২৮শে মার্চ তিনি লোকজন নিয়ে বগুড়ায় যান। রাস্তায় সাধারণ জনতার অনেক ব্যারিকেড দেখতে পান। সকালে রওনা দিয়ে ব্যারিকেডের জন্য বগুড়ায় পৌঁছান সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায়। সেখানে রংপুরের আর্মিদের পেট্রোলিংয়ের সময় ২৯/৩০শে মার্চ রাতে একটি অ্যামবুশ পার্টি পাঠান। তাতে নওগাঁ থেকে যাওয়া কয়েকজন ছাত্র, ইপিআর ও পুলিশের লোকজন ছিলো। তিনটি তিনটনি গাড়িসহ কমপক্ষে এক প্লাটুন সৈন্য পেট্রোলিংয়ে বের হয়। রাস্তার মধ্যে অ্যামবুশ পার্টি তাদেরকে অ্যামবুশ করে। গাড়ি তিনটি বিধ্বস্ত হয়, তিনটি অয়ারলেস সেট দখল করা হয় এবং ২৩ জন নিহত হয়। বাকি সৈন্য ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে রংপুরের দিকে পশ্চাদপসরণ করে।[২৭]

গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী লিখেছেন যে, তাঁর প্রাথমিক পর্যায়ের যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হলো রাজশাহীর প্রতিরোধ যুদ্ধ। এটি ১লা এপ্রিল থেকে ১৪ই এপ্রিলের ঘটনা। ১লা এপ্রিল ভোর ছয়টার মধ্যে রাজশাহী শহরের অদূরে নওহাটায় তাঁদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করেন। মেজর রশীদ সারদা থেকে অগ্রসর হয়ে রাজশাহীর পূর্ব দিকে প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করেন। গিয়াসউদ্দিন চৌধুরীর সঙ্গে সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ, ছাত্র, ইপিআর মিলে বাহিনীর সদস্য সংখ্যা এক হাজারের ওপরে

পৌঁছে যায়। ওদিকে শত্রুবাহিনী তাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ আরও শক্তিশালী করে এবং দিনে দুইবার করে বিমান হামলা চালায়। ৬ই এপ্রিল শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে মুক্তিবাহিনী শহরের ভিতরে ঢুকে পড়ে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বেশ কিছু সংখ্যক লোক নিহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের ৩০-৩৫ জন হতাহত হয়। গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী লিখেছেন,

"রাজশাহী পুলিশ লাইন প্রভৃতি জায়গা থেকে বিপুল অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করি। রাজশাহী পুলিশ লাইনের অস্ত্রাগার থেকে প্রায় তিন হাজার অস্ত্র, তিন লাখ গুলি উদ্ধার করা হয়। ...৭ই এপ্রিল থেকে ১০ই এপ্রিল পর্যন্ত আমরা শত্রুবাহিনীর ছাউনির অতি নিকটে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলি ...প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে শত্রুবাহিনীর মনোবল সম্পূর্ণরূপে ভেঙে যায়। শত্রুবাহিনী সে এলাকার সমস্ত বিহারিকে বিপুল অস্ত্রশস্ত্র বিতরণ করে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করে তাদেরকে সাহায্য করতে নির্দেশ দেয়।"[২৮]

এদিকে হেলিকপ্টার, স্টিমার ও ফেরির মাধ্যমে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দুই ডিভিশন সৈন্য নগরবাড়ি ঘাটে অবতরণ করে। ১৩ই এপ্রিল ভোরের দিকে পাকিস্তানি সৈনিকেরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারা অনবরত আর্টিলারি ফায়ার করতে থাকে এবং জঙ্গি বিমানের হামলা অব্যাহত রাখে। বৃষ্টির মতো গোলা বর্ষণের মুখে গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী ১৪ই এপ্রিল তাঁর বাহিনীকে অপসারণ করে নেন এবং নওয়াবগঞ্জের দিকে সরে আসেন।

মো. জহুরুল ইসলাম বিশু 'পাবনা জেলার মুক্তিযুদ্ধের কথা' গ্রন্থে পাবনা নগরবাড়ি ঘাটে তাঁদের প্রতিরোধ যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেছেন। রফিকুল ইসলাম বকুলের নেতৃত্বে পাবনায় তাঁরা সংগঠিত হয়েছিলেন। নগরবাড়ি ঘাট হয়ে পাকিস্তানি আর্মিরা যাতে শহরে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য বাংকার খুঁড়ে অনেক আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন। ৯ই এপ্রিল আরিচা ঘাট হয়ে ১০ই এপ্রিল শনিবার পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী নগরবাড়ি ঘাটে এসে পৌঁছায়। হানাদার বাহিনী ব্যাপকভাবে চতুর্মুখী আক্রমণ শুরু করে। মুক্তিবাহিনীকে লক্ষ করে দুটি যুদ্ধবিমান বৃষ্টির মতো ব্রাশফায়ার করে। দূর থেকে অথবা নদীর মধ্যে গানবোট থেকে নিক্ষেপ করা মর্টারের শেল বিকট শব্দে চারপাশে পড়তে থাকে। শেলের আঘাত বিশাল গর্ত সৃষ্টি করে ধুলোবালি প্রায় হাজার ফুট ওপরে ছড়িয়ে পড়ে। তারা যেসব বাংকারে অবস্থান করছিলো সেরকমের দশটি বাংকারে একটি শেল পড়লে ধ্বংস হয়ে পুকুর হয়ে যেতো। কোনো উপায় না দেখে তাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাংকার থেকে উঠে কোনোরকমে দৌড়ে ব্রিজের কাছে রাখা জিপে যেয়ে ওঠেন। যখন তাঁরা পিছু হটে দ্রুত শহরের দিকে চলে আসে তখন সকাল ৯টা। নগরবাড়ি ঘাট এবং পাবনা শহর পাকিস্তানি আর্মিদের দখলে চলে যায়।[২৯]

কাজী আব্দুর রশিদ তাঁর 'নওগাঁয় মুক্তিযুদ্ধ' গ্রন্থে রাজশাহীর বিভিন্ন প্রতিরোধ যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেছেন। প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য তিনি নওগাঁ থেকে রাজশাহী যান। আত্রাই থানা পার হয়ে দুই কিলোমিটার যাওয়ার পর রাস্তায় কয়েকজন লোক একটা পুকুর দেখিয়ে বলেন, সেখানে তিনজন পাঞ্জাবি সৈনিক লুকিয়ে আছে। তাদের কাছে কোনো হাতিয়ার নেই। কাজী আব্দুর রশিদ তিনজন

সিপাহীসহ অমৃতলাল চাকমা নামের হাবিলদারকে সেখানে পাঠান। সাথে অনেক সাধারণ লোক যায়। সেই সাধারণ লোকজন পাকিস্তানি সৈনিকদের ঘেরাও করে ধরে আনে। অমৃতলাল চাকমা তাদেরকে গুলি করে মেরে ফেলেন। বেয়নেট দিয়ে পাকিস্তানি সৈনিকদের পেট চিরে দেখেন কাঁঠালের মুচি, গাছের পাতা ছাড়া আর কিছু সেখানে নেই।[৩০]

কাজী আব্দুর রশিদ আরো জানাচ্ছেন যে, আর্মিদের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করবার জন্য এপ্রিলের ১০ তারিখ সেক্টর কমান্ডার নাজমুল হকের নির্দেশে তিনি রাজশাহী থেকে নগরবাড়ি ঘাটে যান। যখন তাঁরা পৌঁছান ততক্ষণে পাকিস্তানি আর্মি পাবনা শহরের টাউন হলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তিন রাস্তার মোড়ে কলেজের পিছনে তিন ইঞ্চি মর্টার এবং মেশিনগান সেট করে কয়েকবার ব্রাশ ফায়ার করলে পাকিস্তানি আর্মি আর্টিলারি ফায়ার শুরু করে। তাঁরা পশ্চাদপসরণ করেন। পিছিয়ে এসে মুলাটুলি নামক গ্রামে ব্রিজের পাশে পজিশন নেন। উপযুক্ত জায়গায় মর্টার বসিয়ে ব্রিজের দুই পাশে মেশিনগান লাগান। এলাকার লোকজন নিয়ে ব্রিজের ওপর কাঠ ফেলে ব্যারিকেড দেন। আনুমানিক রাত দশটায় পাকিস্তান আর্মির গাড়ির শব্দ পান। ওদের বিশাল বহরে গাড়ির সংখ্যা ১০৮। দুই ধারে সৈন্য মাঝখানে গাড়ি Advance to Contact পদ্ধতিতে ওরা এগিয়ে আসে। ব্রিজের ওপর কিছুক্ষণ থেমে ওরা ব্যারিকেড সরাতে আরম্ভ করে। কাজী আব্দুর রশিদ ফায়ার ওপেন করার নির্দেশ দেন। দুই পক্ষের মধ্যে প্রায় এক ঘণ্টা তুমুল যুদ্ধ হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের একজন সিপাহী মারা যায় আর শত্রুপক্ষের মারা যায় অনেকে। শত্রুপক্ষ ফায়ার বন্ধ করে পিছু হটে।

কাজী আব্দুর রশিদের স্মৃতিকথায় আরো রয়েছে যে, তাঁরা মুলাটুলি থেকে এগিয়ে গিয়ে ঝলমলিয়া নামক জায়গায় পজিশন নেন। শত্রুবাহিনী তাঁদের ফাঁদের মধ্যে ঢোকামাত্র তাঁরা ফায়ার ওপেন করেন। আনুমানিক বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত তাঁদের যুদ্ধ চলে। গাড়ির লম্বা বহর বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত দেখা গেছে। তারপর আর দেখা যায়নি। জীবিত যারা ছিল তারা পালিয়ে গেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের তিন ইঞ্চি মর্টারের বোমাও আর ছিল না। লোকজন এসে খবর জানায় শত্রুপক্ষের ৩০০ লোকের বেশি মারা গেছে। আটটা গাড়ি রাস্তার নিচে পড়ে আছে। জীবিত কোনো লোক নেই। এরপর কাজী আব্দুর রশিদ মর্টারের গোলার খোঁজে চারঘাট যান। খুব জোরে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয়। চলে রাত একটা পর্যন্ত। ফিরে এসে বানেশ্বরে বাধাপ্রাপ্ত হন। এরপর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেননি।[৩১]

এম আব্দুর রহিম দিনাজপুরে প্রতিরোধ যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেছেন। তিনি এই যুদ্ধে সম্পৃক্ত ছিলেন। ২৯শে মার্চ দিনাজপুরের কুঠিবাড়িতে অবস্থানরত কয়েকজন ইপিআরের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করেন। একাজে ইপিআরের মোজাফ্ফর তাঁকে সহযোগিতা করেন। যুদ্ধের জন্য বাঙালি ইপিআর সদস্যরা তখন মানসিকভাবে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। মোজাফ্ফরের মাধ্যমে খবর পেয়ে বাঙালি ইপিআর সদস্যরা বিদ্রোহ করেন। পাকিস্তানি ও অবাঙালি সদস্যরা পাল্টা আক্রমণ করে। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানিরা কুঠিবাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। সেক্টর হেডকোয়ার্টার এবং সার্কিট হাউজ থেকে পালিয়ে ২৯শে মার্চ রাতের আঁধারে তারা সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে চলে যায়। এই যুদ্ধে ইপিআরদের সঙ্গে

পুলিশ, মুজাহিদ এবং আনসার সদস্যরা যোগ দিয়েছিলেন। সেক্টর হেডকোয়ার্টার থেকে যাওয়ার সময় তাঁরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যান। পাকিস্তানিদের পরাজিত করে এম আব্দুর রহিম ইপিআর সৈনিকদের নিয়ে কোকুইডাঙি আমবাগানে রাত্রিযাপন করেন। সেখানে গ্রামের সাধারণ মানুষ তাঁদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে। এরপর ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত দিনাজপুর হানাদার মুক্ত ছিলো।[৩২]

নাসির উদ্দিন 'যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা' গ্রন্থে সৈয়দপুরে প্রতিরোধ যুদ্ধের কথা লিখেছেন। সেখানে বাঙালি ক্যাপ্টেন আনোয়ারের নেতৃত্বে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হয়। মেজর নাসির উদ্দিন লিখেছেন,

"পশ্চিম দিক থেকে গোলার আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিলো। সৈয়দপুরে ভোর থেকেই আক্রমণের পর আক্রমণ চললো ৩ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্ষুদ্র দলটির ওপর। ...রাতভর উপর্যুপরি আক্রমণের মুখে ক্ষতবিক্ষত ক্যাপ্টেন আনোয়ার সকাল ১০টার দিকে তাঁর অসম বাহিনী নিয়ে সৈয়দপুর সেনানিবাস ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু এই প্রতিরোধ যুদ্ধে ইতিমধ্যেই তাঁর বাহিনীর অন্তত ৫০ জন বাঙালি সৈনিক নিহত বা আহত হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের ঊষালগ্নে এভাবেই শহিদী মৃত্যুর এই মহান দীপশিখাটি জ্বালিয়ে যায় সৈয়দপুর সেনানিবাসের ক্ষুদ্র একটি অপেশাদার দলের বাঙালি সৈনিকেরা।"[৩৩]

কে. এম. সফিউল্লাহ্ 'মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ' গ্রন্থে ময়মনসিংহে বাঙালি ইপিআর সদস্যদের পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের বিবরণ দিয়েছেন। কে. এম. সফিউল্লাহ তখন তাঁর বাহিনী নিয়ে টাঙ্গাইল এবং মুক্তাগাছা হয়ে ময়মনসিংহের পথে। ২৭শে মার্চ থেকে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বাঙালি সৈন্যরা বিরামহীনভাবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। গভীর রাতে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈনিকদের হাতে যতো অস্ত্র ছিলো এক সঙ্গে গর্জে ওঠে। বাঙালি সৈনিকেরা আগে থেকেই সতর্ক এবং অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত ছিলেন। অবিলম্বে অবস্থান নিয়ে তাঁরা প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নেন। প্রায় অর্ধ মাইল দূরে মেজর নুরুল ইসলাম এবং লে. মান্নান সিএন্ডবি রেস্ট হাউসে অবস্থান করছিলেন। সেই রেস্ট হাউসের দিকেও গুলিবর্ষণ করা হয়। তারা দুই জনে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদের ধার ঘেঁষে পায়ে হেঁটে শহরে পৌঁছেন। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস লাইনে তখন প্রচণ্ড গোলাগুলি। ২৮শে মার্চ দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত থাকে। বাঙালি সৈন্যরা অদম্য সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবিলা করে ছয় জন পাকিস্তানি সৈন্য গ্রেফতার করেন এবং বাকিরা নিহত হয়।[৩৪]

সুকেশচন্দ্র দেব মুক্তিযুদ্ধের একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি 'একাত্তরে সিলেট : প্রতিরোধ ও সশস্ত্র যুদ্ধ' গ্রন্থে সিলেটে প্রতিরোধ যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেছেন। সেখানে ২৮শে মার্চ অবসরপ্রাপ্ত সুবেদার মোশারফ এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যরা ইপিআর ছাউনিতে এবং পুলিশ লাইনে যান। বেঙ্গল রেজিমেন্টের ১২ জন, মুজাহিদ বাহিনীর ৮ জন এবং আখালিয়ার নায়েক সুবেদার আবদুল জলিলের নেতৃত্বাধীন ৩৫ ইস্ট বেঙ্গলের ৬০ জন সৈনিক নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ঐ দিন সন্ধ্যা ৬টার দিকে পাকিস্তানি আর্মি আখালিয়াস্থ ইপিআর ছাউনিতে আক্রমণ করে। মুক্তিবাহিনী প্রতিরোধ যুদ্ধে

অংশগ্রহণ করেন। দক্ষিণ সুরমায় সমবেত হওয়া ছাত্র-জনতা, রাজনৈতিককর্মী মুহুর্মুহু 'জয়বাংলা জয়বঙ্গবন্ধু' শ্লোগান দিতে থাকেন। এলাকার সমবেত লোকজন দেশিয় অস্ত্র নিয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নেন। অনেকে সাঁতরায়ে সুরমা পার হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সামিল হন। এ যুদ্ধে পাকিস্তানি আর্মি পরাজিত হয় এবং পালিয়ে সালুটিকর বিমানবন্দরের কাছে সেনা ক্যাম্পে অবস্থান নেয়। পরে শক্তি সঞ্চয় করে রাতে গাড়ির বাতি নিভিয়ে পাকিস্তানিরা আখালিয়ায় আবার আক্রমণ করে। মুক্তিযোদ্ধারা টিকতে না পেরে বাদাঘাটের দিকে সরে পড়ে। পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে মুক্তিযোদ্ধারা সিলেট শহর আক্রমণ করেন।[৩৫]

আখতার আহমেদ 'বারবার ফিরে যাই' গ্রন্থে খালেদ মোশাররাফের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেছেন। ২২শে মার্চ ১৯৭১ খালেদ মোশাররাফের কুমিল্লায় ৪র্থ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের টুআইসি হিসেবে পোস্টিং হয়। তখন ৪র্থ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল খিজির হায়াত খান। খিজির হায়াত খান চাচ্ছিলেন না খালেদ মোশাররাফের মতো একজন চৌকস বাঙালি অফিসার ৪র্থ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের টুআইসি হয়ে সৈন্যদের কাছাকাছি আসার সুযোগ পাক। তাই খিজির হায়াত খান তাঁকে ২২ তারিখেই আলফা কোম্পানি নিয়ে শমসেরনগর পাঠিয়ে দেন। উদ্দেশ্য নকশালদের অত্যাচার দমন করা। কিন্তু ২৫শে মার্চ শমসেরনগর পৌঁছে তিনি কোনো নকশাল পেলেন না। তিনি বুঝলেন ষড়যন্ত্র করে তাঁকে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। খালেদ মোশাররাফ তাঁর কনভয়ে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে বিদ্রোহ করে তেলিয়াপাড়ায় তাঁর ঘাঁটি স্থাপন করেন। নতুন সদস্য রিক্রুট করে পাকিস্তানিদের প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার কাজ শুরু করেন। আখতার আহমেদ উল্লেখ করেছেন যে, ২৮শে মার্চ তাঁর ওপর আধাসামরিক, রিটায়ার্ড আর্মি ও স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে একটা নতুন কোম্পানি গঠন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২৯শে মার্চ তাঁদের নিয়মিত বাহিনীর কিছু অংশ ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের বিভিন্ন দিকে ডিফেন্সে যায়। বেলা বারোটা নাগাদ শহরের দক্ষিণ দিক থেকে গুলির আওয়াজ পাওয়া যায়। সাধারণ লোক নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ছুটাছুটি করে। এরই মধ্যে শহরের দিক থেকে খালেদ মোশাররাফ জিপ নিয়ে ছুটে আসেন। আর্মির ব্যারেটা ক্যাপ খুলে গাড়ি থেকে তিনি জানালেন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। হুকুম দিলেন কনভয় রেডি করে রওনা দিতে। গাড়িগুলো তৈরি হয়ে একের পর এক লাইন দিয়ে দাঁড়াতে থাকে। এর মধ্যে যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। গোলাগুলির শব্দ থেমে যায়। খবর আসে, ব্রিজের ওপারে আর্মির দুটো জিপ এসেছিলো। তাঁরা বাঙালি আর্মিদের অ্যামবুসে পড়ে যায়। পাকিস্তানি আর্মিরা পালাবার চেষ্টা করে। একটা জিপ কোনো রকমে পালিয়ে যায়। পাকিস্তানের কয়েকজন মারা যায়। কিন্তু বাঙালির কোনো ক্ষতি হয় না। আখতার আহমেদ লিখেছেন এটা তাঁদের যুদ্ধের প্রথম স্বাদ। যুদ্ধ ছোটো হলেও জয়টা বাঙালিদের দিকেই ছিলো।[৩৬]

শাফায়াত জামিল 'মুক্তির জন্যে যুদ্ধ' গ্রন্থে ২৯শে মার্চ কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তানিদের আক্রমণ এবং বাঙালি সেনাদের প্রতিরোধের স্মৃতিচারণ করেছেন। এদিন বিকেলে ক্যান্টনমেন্টে ৪র্থ বেঙ্গলের

রিয়ার হেডকোয়ার্টারের ওপর পাকিস্তানি আর্মি আর্টিলারি গান ও থ্রি কমান্ডো ব্যাটালিয়নের সাহায্যে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। বাঙালি যেসব জওয়ান রিয়ার হেডকোয়ার্টারের দায়িত্বে ছিলো তারা সংগঠিত হয়ে প্রবল বাঁধা দেয়। দুই পক্ষের মধ্যে প্রায় ছয় ঘণ্টা যুদ্ধ চলে। রাত নেমে এলে পাকিস্তানিদের আক্রমণ কিছুটা স্তিমিত হয়। তখন কয়েকজন জেসিও এবং এনসিওর নেতৃত্বে অধিকাংশ সৈন্য তাদের পরিবারসহ ক্যান্টনমেন্টের মরণ ফাঁদ থেকে বের হয়ে আসতে সক্ষম হয়। আট-দশ জন জওয়ান এ যুদ্ধে শহিদ হন। পাকিস্তানিদেরও অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়।[৩৭]

রফিকুল ইসলাম তাঁর 'লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে' গ্রন্থে ২৫/২৬শে মার্চ চট্টগ্রামে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেছেন। পাকিস্তানি সৈন্যরা চট্টগ্রামের 'নেভাল বেইজ' থেকে বের হয়ে এসে হালিশহরে বাঙালি ইপিআর বাহিনীর অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালায়। তাঁর সৈন্যরা পাকিস্তানি বাহিনীর সে আক্রমণ প্রতিহত করে এবং অনেক পাকিস্তানিকে হতাহত করে। পাকিস্তানিরা ভাবতে পারেনি সংগঠিত এতো বড়ো প্রতিরোধের সম্মুখীন তারা হবে। আক্রমণকারী পাকিস্তানি বাহিনীর অগ্রবর্তী দলটি হালিশহরে প্রতিরক্ষা ব্যূহের মধ্যে আসতেই বাঙালি সৈন্যরা পাকিস্তানিদের লক্ষ করে গুলি চালানো শুরু করে। ঘটনার আকস্মিকতায় পাকিস্তানিরা হতচকিত হয়ে পড়ে এবং দ্রুত তাদের বেইজে ফিরে যায়।[৩৮]

রফিকুল ইসলাম কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম অভিমুখী ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফির নেতৃত্বে পাকিস্তানি কনভয়কে প্রতিরোধের স্মৃতিচারণ করে। তিনি লিখেছেন,

"২৬শে মার্চ ভোর ৪টার দিকে টেলিফোনে 'মেসেজ' পেলাম যে ৮০ থেকে ১০০ গাড়ির একটা বড়ো 'কনভয়' কুমিল্লা ছেড়ে চট্টগ্রামের দিকে রওনা দিয়েছে। কুমিল্লা টেলিফোন এক্সচেঞ্জে কর্মরত জনাব শাকুর এই 'মেসেজটি' চট্টগ্রাম টেলিফোন এক্সচেঞ্জের অপারেটরকে পাঠিয়ে দেন এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পুরো খবরটি জানিয়ে দেন। এ 'মেসেজটি' কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে কর্মরত বাঙালি মেজর বাহার আমাকে পাঠিয়েছিলেন। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই আমি হালিশহর থেকে একজন জেসিওর নেতৃত্বে এক কোম্পানি সৈন্য পাকিস্তানের এই দলটিকে অ্যামবুশ করার জন্য পাঠিয়ে দিলাম। হালকা এবং ভারী মেশিনগান ছাড়াও আমাদের এই কোম্পানির সঙ্গে ছিলো মর্টার ও রকেট লাঞ্চার।"[৩৯]

পাকিস্তানের যে কনভয়টি কুমিল্লা থেকে যাচ্ছিলো সেখানে ছিলো ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সেস রেজিমেন্ট, ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ার্সের একটি ছোটো দল, ৮৮ মর্টার ব্যাট্রি এবং ৩ কমান্ডো ব্যাটলিয়ানের সৈন্য। এরা সবাই সকালে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করে। কুমিল্লা থেকে ১০০ মাইল দূরে চট্টগ্রামের পথে এই কনভয়টিকে অনেক কালভার্ট এবং ব্রিজ অতিক্রম করতে হয়। পাকিস্তানি সৈন্যদের চলাচলে বাধা সৃষ্টির করার জন্য স্থানীয় জনগণ এসব কালভার্ট, ব্রিজের অধিকাংশ ক্ষতিগ্রস্ত করে দেয়। পাকিস্তানিরা বিকল্প রাস্তা করে এগুতে থাকে এবং 'ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ার্সে'র সহায়তায় ব্রিজগুলো সাময়িকভাবে মেরামত করে নেয়। ওদিকে বাঙালি সৈনিকেরা পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী 'শুভপুর ব্রিজ' বেশ ক্ষতিগ্রস্ত করে রাখেন। সেজন্য শুভপুর ব্রিজে গিয়ে পাকিস্তানি কনভয়টি আটকে

যায়। শুভপুর ব্রিজ মেরামত করতে সময় লাগবে দেখে ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি ইন্‌ফ্যান্ট্রি এবং কিছু মর্টার নিয়ে চট্টগ্রামের দিকে যাত্রা অব্যাহত রাখেন। বাকিদের বলে গেলেন ব্রিজটি মেরামত করে মূল কনভয়টির সঙ্গে যোগ দিতে। ২৬শে মার্চ সন্ধ্যায় ইকবাল শফি এবং তাঁর সৈন্যদল চট্টগ্রাম থেকে ১২ মাইল দূরে কুমিরায় পৌঁছে। কুমিরায় বাঙালি ইপিআর সৈন্যরা তখন অ্যামবুশের অপেক্ষায়। কুমিরায় পৌঁছে ব্রিগেডিয়ার শফি বেশ সন্তুষ্ট ছিলেন চট্টগ্রামের পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিবেন বলে। কিন্তু হঠাৎ করে মারাত্মক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। সুশিক্ষিত এবং আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত তাঁর সৈন্যদের অর্ধেকের বেশি বাঙালি সৈন্যদের অ্যামবুশের ফাঁদে পড়ে যায়। কুমিরা মহাসড়কের সে পাশে স্থানীয় জনগণ আগে থেকেই ব্যারিকেড স্থাপন করেছিলো। সন্ধ্যা ৭টায় পাকিস্তানি সৈন্যরা যখন ব্যারিকেড সরাবার জন্য থামে, বাঙালি সৈন্যরা পাকিস্তানিদের ওপর তখন একযোগে ব্যাপক গুলিবর্ষণ করে। ডান, বাম এবং সম্মুখ তিন দিক থেকেই ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটে আসতে দেখে দিশেহারা হয়ে পড়ে ইকবাল শফি এবং তাঁর সৈন্যরা। রফিকুল ইসলাম লিখেছেন যে, কুমিরার সেই অ্যামবুশে পাকিস্তানিদের অনেক যানবাহন ধ্বংস হয় এবং ৭০ জনেরও অধিক হতাহত হয়। অ্যামবুশ সফল হওয়ার পর বাঙালি সৈন্যরা চট্টগ্রাম শহরের দিকে সরে এসে কুমিরা থেকে পাঁচ মাইল দূরে মহাসড়কের ওপরে ভাটিয়ারী এলাকায় অস্থায়ী অবস্থান গ্রহণ করে। কুমিরার অ্যামবুশ এবং পরবর্তী সংঘর্ষে বাঙালিদের ১৪ জন হতাহত হয়। কুমিরায় পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সফল অপারেশনটি ছিলো মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর প্রভাব ছিলো সুদূরপ্রসারী। পাকিস্তানি সৈন্যরা বিনা বাঁধায় অনায়াসে চট্টগ্রাম দখল করে নেওয়ার যে পরিকল্পনা করেছিলো বাঙালিদের সময়োচিত অ্যামবুশের কারণে তা নস্যাৎ হয়ে যায়।[৪০]

উপসংহার

অপারেশন সার্চ লাইটের সময় থেকে এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশের সর্বত্র অসংখ্য প্রতিরোধ যুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছে, কিন্তু সংঘটিত যুদ্ধের অনুপাতে প্রকাশিত স্মৃতিকথার সংখ্যা কম। প্রাপ্ত স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় বাংলাদেশের সাধারণ জনতা ও মুক্তিযোদ্ধারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। প্রায় সকল স্মৃতিকথায় উঠে এসেছে যে, ভারী অস্ত্র না থাকলেও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে এদেশের মানুষ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় তারা শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। অনেক স্মৃতিকথায় সাধারণ জনতা, ইপিআর, আনসার, পুলিশ, মুজাহিদ ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের আর্মিদের সম্মিলিত অংশগ্রহণের চিত্র রয়েছে।

অধিকাংশ স্মৃতিকথায় প্রাথমিক প্রতিরোধে বাঙালি জনতার সফলতার চিত্র পাওয়া যায়। তবে অনেকের স্মৃতিচারণে যুদ্ধে তাঁদের বীরত্ব প্রকাশের আধিক্য লক্ষ করা যায়। অনেক স্মৃতিকথায় পাকিস্তানি আর্মির পিছু হটার চিত্র রয়েছে। কোনো কোনো স্মৃতিকথায় পাকিস্তানি আর্মির পাল্টা আক্রমণে মুক্তিবাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙে পড়ার চিত্র রয়েছে।[৪১] সর্বোপরি প্রাথমিক প্রতিরোধে যেসব স্মৃতিকথা পাওয়া যায় তাতে বাঙালি জনতার অকৃত্রিম দেশপ্রেম ও দৃঢ় মনোবলের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

তথ্যসূত্র

১. আবু আক্কাস আহমেদ, *মুক্তিযুদ্ধ: রণাঙ্গন নেত্রকোণা*, ঢাকা: সেন্টার ফর বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার স্টাডিজ, ২০১৭, পৃষ্ঠা-৩৪

২. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৫

৩. জিয়াউদ্দিন আহমেদ, *মুক্তিযুদ্ধে সুন্দরবন*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৭, পৃষ্ঠা-৭০

৪. মুকুল মোস্তাফিজ, *মুক্তিযুদ্ধে রংপুর*, ঢাকা: গতিধারা, ২০১১, পৃষ্ঠা-৩৬

৫. আবুবকর সিদ্দিক, "একটি স্বস্তিকর মৃত্যুসংবাদ ও অবরুদ্ধ যুদ্ধদশা", *শৈলী*, ঈদ সংখ্যা ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-৩০১

৬. তদেব, পৃষ্ঠা-৩০৪

৭. মাহফুজুর রহমান, *মুক্তিযুদ্ধে হবিগঞ্জ*, ঢাকা, গতিধারা, ২০০৯, পৃষ্ঠা-১৯

৮. কাদের সিদ্দিকী, *স্বাধীনতা '৭১*, ঢাকা, অনন্যা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৫২

৯. আবু সাঈদ খান, *মুক্তিযুদ্ধে ফরিদপুর*, ঢাকা, সাহিত্য বিকাশ, ২০১০, পৃষ্ঠা-৪৮

১০. মনজুর মোরশেদ সাচ্চু, *মুক্তিযুদ্ধ ও দেরাদুনে ষাট দিন*, ঢাকা, জাগৃতি প্রকাশনী, ২০১৭, পৃষ্ঠা-১৪

১১. তদেব, পৃষ্ঠা-১৯

১২. সাক্ষাৎকার : এ কে এম ওয়াহেদুল ইসলাম, অন্তর্গত *দিনাজপুরে মুক্তিযুদ্ধ*, মোহাম্মদ সেলিম সম্পা., ঢাকা, বাংলাদেশ চর্চা, ২০১১, পৃষ্ঠা-১৪০

১৩. আবু জাফর শামসুদ্দীন, *আত্মস্মৃতি*, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৫, পৃষ্ঠা-৫৩৭

১৪. সাক্ষাৎকার: ব্রিগেডিয়ার চিত্তরঞ্জন দত্ত, অন্তর্গত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র-দশম খণ্ড*, হাসান হাফিজুর রহমান সম্পা., ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা-৩৩৭

১৫. *বাংলাপিডিয়া* (২০০৩), "অপারেশন সার্চলাইট" ভুক্তি

১৬. আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি*, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯০, পৃষ্ঠা-১

১৭. তদেব, পৃষ্ঠা-২

১৮. তদেব, পৃষ্ঠা-৪

১৯. আবুল মাল আবদুল মুহিত, *স্মৃতি অম্লান ১৯৭১*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৩৬

২০. সাক্ষাৎকার: এম, এ, জলিল, বরিশালে রণাঙ্গন, অন্তর্গত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*: দশম খণ্ড,

হাসান হাফিজুর রহমান সম্পা., ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা-৫৪৪

২১. গোলাম মোস্তফা গিয়াসপুরী, *মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস: রাজবাড়ী জেলা*, ঢাকা: তাম্রলিপি প্রকাশনী, ২০১৭, পৃষ্ঠা-৬৬

২২. হাফিজ উদ্দিন আহমদ, *রক্তে ভেজা একাত্তর*, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-১৮

২৩. তদেব, পৃষ্ঠা-২৫

২৪. কাজী আনোয়ারুল ইসলাম, *আমার একাত্তর*, ঢাকা, অবসর প্রকাশনী, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-৪৯

২৫. মনসুর আহমদ খান, "মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্বে রাজশাহী, যুদ্ধপর্ব বিজয় এবং যাঁদের আত্মত্যাগে এদেশ", অন্তর্গত, *মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী*, মনসুর আহমদ খান সম্পা., ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৬৬

২৬. গিয়াসউদ্দীন চৌধুরী, "সশস্ত্র প্রতিরোধ: রাজশাহী," অন্তর্গত যুদ্ধে *যুদ্ধে একাত্তরের নয়মাস*, আবুল হাসেম সম্পা., ঢাকা, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ২০১৪, পৃষ্ঠা-১২৫

২৭. তদেব, পৃষ্ঠা-১২৫

২৮. তদেব, পৃষ্ঠা-১২৮

২৯. মো. জহুরুল ইসলাম বিশু, *পাবনা জেলার মুক্তিযুদ্ধের কথা*, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৯, পৃষ্ঠা-৫৫

৩০. কাজী আব্দুর রশিদ, *নওগাঁয় মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা, একাত্তর প্রকাশনী, ২০১৮, পৃষ্ঠা-৪৬

৩১. তদেব, পৃষ্ঠা-৫৩

৩২. সাক্ষাৎকার: এম আব্দুর রহিম, অন্তর্গত *দিনাজপুরে মুক্তিযুদ্ধ*, সম্পা. মোহাম্মদ সেলিম, ঢাকা, বাংলাদেশ চর্চা, ২০১১, পৃষ্ঠা-৩২

৩৩. নাসির উদ্দিন, যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃষ্ঠা-১৬০

৩৪. কে. এম. সফিউল্লাহ্, *মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ*, ঢাকা, আগামী প্রকাশ, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৫৫

৩৫. সুকেশচন্দ্র দেব, *একাত্তরে সিলেট: প্রতিরোধ ও সশস্ত্র যুদ্ধ*, সিলেট, বাসিয়া প্রকাশনী, ২০১৮, পৃষ্ঠা-২৪

৩৬. আখতার আহমেদ, *বার বার ফিরে যাই*, ঢাকা, সেন্টার ফর বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার স্টাডিজ, ২০১৭, পৃষ্ঠা-৫৫

৩৭. শাফায়াত জামিল, *মুক্তির জন্য যুদ্ধ*, ঢাকা, দিব্য প্রকাশ, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-২৬

৩৮. রফিকুল ইসলাম, *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*, পরিমার্জিত দশম মুদ্রণ, ঢাকা, অনন্যা প্রকাশনী, ২০১৬, পৃষ্ঠা-১৪৭

৩৯. তদেব, পৃষ্ঠা-১৪৮

৪০. তদেব, পৃষ্ঠা-১৫০

৪১. গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী বগুড়ায় ২৯/৩০শে মার্চ রাতে রংপুরের আর্মিদের পেট্রোলিংয়ের সময় একটি অ্যামবুশ পার্টি পাঠান। সেখানে তিনটি তিনটনি গাড়িসহ কমপক্ষে এক প্লাটুন সৈন্য পেট্রোলিংয়ে বের হয়। রাস্তার মধ্যে অ্যামবুশ পার্টি তাদেরকে অ্যামবুশ করে। গাড়ি তিনটি বিধ্বস্ত হয়, তিনটি অয়ারলেস সেট দখল করা হয় এবং ২৩ জন নিহত হয়। বাকি সৈন্য ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে রংপুরের দিকে পশ্চাদপসরণ করে। গিয়াসউদ্দীন চৌধুরী, "সশস্ত্র প্রতিরোধ : রাজশাহী", অন্তর্গত যুদ্ধে যুদ্ধে একাত্তরের নয়মাস, আবুল হাসেম সম্পা., ঢাকা, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ২০১৪, পৃষ্ঠা-১২৫

৪২. কাজী আব্দুর রশিদের নেতৃত্বে রাজশাহীর মুলাটুলি ও ঝলমলিয়া যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা জয়লাভ করে, কিন্তু বিকাল ৫টার পর তাঁদের তিন ইঞ্চি মর্টারের বোমা শেষ হয়ে যায়। তাঁদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙে পড়ে। ঐ মুহূর্তে তাঁরা আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেননি। কাজী আব্দুর রশিদ, নওগাঁয় মুক্তিযুদ্ধ, ঢাকা, একাত্তর প্রকাশনী, ২০১৮, পৃষ্ঠা-৪৬